আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষণ বাংলাদেশ

IFI WATCH
BANGLADESH

বর্ষ ২, সংখ্যা ৩
নভেম্বর ২০০৫

আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যসংস্থা সংক্রান্ত কার্যদল, বাংলাদেশ

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও অ-কৃষি পণ্যের বাজারে প্রবেশাধিকার

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার 'অ-কৃষি পণ্যের বাজারে প্রবেশাধিকার' বা 'নামা' বিষয়ক বাণিজ্য আলোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আগামী ১৩-১৮ ডিসেম্বর হংকং-য়ে সংস্থার মন্ত্রী পর্যায়ের যে ৬ষ্ঠ বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, তাতে কৃষির পরই আলোচনায় থাকছে এই নামা (নন এগ্রিকালচারাল মার্কেট এক্সেস)। এই আলোচনায় যদিও দৃশ্যমান লড়াইটা হচ্ছে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে, বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর স্বার্থ ঠিকই জড়িয়ে আছে।

নামা আলোচনার মূল বিষয় কেন্দ্রিভূত হয়েছে শিল্পজাত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক কমানো নিয়ে। শুল্কের পাশাপাশি অশুল্ক প্রতিবন্ধকতার বিষয়টিও আলোচনায় থাকছে। দরকষাকষিটা হচ্ছে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো কিভাবে ও কী হারে আমদানি শুল্ক হার হ্রাস করবে এবং এর মাধ্যমে সবচেয়ে ধনী দেশগুলো মাঝারি আয়ের দেশগুলোকে তাদের শিল্পপণ্য তুলনামূলকভাবে কম খরচে ধনী দেশগুলোয় রপ্তানি করার সুযোগ দেবে। একই সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশগুলোকেও আমদানি শুল্ক হার কমিয়ে আনতে হবে যেন উন্নত দেশ তাদের পণ্য রপ্তানি বাড়াতে পারে। এই আলোচনা ফলপ্রসূ হলে দুই ধরনের দেশকেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট হারে শুল্ক কমানোর প্রতিশ্রুতি দিতে হবে এবং তা কার্যকর করতে হবে। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে অবশ্য কোনো ধরনের শুল্ক কমানোর প্রতিশ্রুতি দিতে হবে না। তার মানে এই নয় যে 'নামা'য় বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর কোনো ধরনের সমস্যা বা সংকট নেই। এখানে সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিচ্ছে উন্নত দেশগুলো তাদের বাজারে পণ্য রপ্তানির জন্য যেসব বাড়তি বা অগ্রাধিকারমূলক সুবিধা দিয়েছিল সেসব সুবিধা লাভ কমে যাওয়া। একে বলা হ"ছ প্রেফারেন্স ইরোসন। যেমন, ইউরোপের বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানি করতে বাংলাদেশকে কোনো শুল্ক দিতে হয় না বা ঐ দেশের পণ্য আমদানিকারকদের কাছ থেকে সরকার কোনো শুল্ক নেয় না। তবে ভারত একই পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বা ঐ দেশীয় আমদানিকারক ভারতীয় পণ্যের জন্য ১০% আমদানি শুল্ক দেয়। তার মানে, ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশী পণ্য ভারতীয় পণ্যের চেয়ে ১০% বাড়তি শুল্ক সুবিধা পায়। ধরা যাক এখন নামার আওতায় ভারতীয় পণ্যের জন্য শুল্ক হার ৬% করা হলো। বাংলাদেশকে যেহেতু আগেই শুন্য শুল্ক দিয়ে দেয়া হয়েছে, সেহেতু নতুন কোনো শুল্ক সুবিধা দেয়ার সুযোগ নেই। ফলে, ভারতীয় পণ্যের সঙ্গে বাংলাদেশী পণ্যের শুল্ক সুবিধা ১০% থেকে কমে হলো ৬%। এই যে সুবিধাটি কমে গেলো, এটিই হলো প্রেফারেন্স ইরোসন। আগে প্রতিযোগী দেশের সঙ্গে এটি তাও নামা আলোচনা সফল হাওয়ার পরের চিত্র। তার আগেই বা বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলো উন্নত বিশ্বের বাজারে প্রকৃতপক্ষে কতখানি সুবিধা পাচ্ছে তাও যাচাই করা দরকার। বর্তমান চিত্র বিশেষণ করলে বরং এটাই বলা যায় যে উন্নত দেশগুলো গরীব দেশগুলোর সঙ্গে নানা ধরনের কায়দা-কানুন করে বৈষম্যমূলক আচরণ চালাচ্ছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর শিল্পজাত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে উন্নত বিশ্ব উচ্চ হারে শুল্ক আরোপ ও শুল্ক বৃদ্ধির পাশাপাশি কঠিন রুলস অব অরিজিন (পণ্য উৎপাদনে কাচাঁমাল ব্যবহার ও মূল্য সংযোজনের বিধি), এন্টি ডাম্পিং, স্বাস্থ্য-নিরাপত্তার মতো অশুল্ক প্রতিবন্ধকতাও আরোপ করেছে।

২০০৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশগুলো গড়ে ৪.৯% হারে শুল্ক দিয়েছে, যেখানে উন্নত দেশগুলো দিয়েছে ০.৯৮% হারে। অর্থাৎ স্বল্পোন্নত দেশগুলো উন্নত দেশগুলোর তুলনায় প্রায় ৫০০% বা পাঁচগুণ বেশি শুল্ক দিয়েছে। এই বছর যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী পণ্য রপ্তানির চিত্রটি দেখা যাক। গড়ে বাংলাদেশী পণ্য আমদানির ওপর যুক্তরাষ্ট্র ১৫.৮৭% হারে আমদানি শুল্ক আদায় করেছে। অথচ যুক্তরাষ্ট্রে সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত দেশ বা 'এমএফএন' শুল্কহার হলো ৩.৭%। প্রসঙ্গত এমএফএন (মোস্ট ফেভারিট নেশানস্) হলো বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সেই শর্ত যেখানে একটি সদস্য দেশ অন্য কোনো সদস্য দেশকে কোনো ক্ষেত্রে শুল্কসহ যে কোনো ধরনের সুবিধা দিলে তা সংস্থার সদস্যভুক্ত সকল দেশের জন্য প্রযোজ্য হবে। বাংলাদেশের উদাহরণ থেকেই পরিস্কার যে বাস্তবে তা হচ্ছে না।

উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর তুলনায় উন্নত দেশগুলোর পণ্য যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে অনেক বেশি শুল্ক সুবিধা পাচ্ছে।

আলোচ্য বছরে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২০৭.৩৫ কোটি ডলার। এর মধ্যে ৫১% পণ্য রপ্তানিতে গড়ে ১৫%-২০% হারে শুল্ক দিতে হয়েছে। ৯% পণ্য রপ্তানিতে শুল্কহার ৩২% থেকে ৩৭.৫%-য়ের মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে। সবমিলিয়ে ২০০৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশী পণ্য থেকে ৩২ কোটি ৯১ লাখ ডলারের বেশি শুল্ক আদায় করেছে যা কানাডা, সুইডেন, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড ও স্পেনের মতো ধনী দেশগুলো থেকে পণ্য আমদানিতে আদায়কৃত শুল্কের চেয়ে বেশি। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশী কোনো পণ্যকেই শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা দেয়নি।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য হলো তৈরি পোশাক। নিটওয়্যার ও ওভেন গার্মেন্টস যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিকৃত তৈরি পোশাকের

উন্নয়ন অন্বেষণ
Unnayan Onneshan
The Innovators
centre for research and action on development

সচিবালয়
উন্নয়ন অন্বেষণ - The Innovators
বাড়ি - ৪০/এ, সড়ক- ১০/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৯, বাংলাদেশ। ফোন: ৮৮০-২-৮১৫ ৮২৭৪
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮১৫ ৯১৩৫, ই-মেইল: info@unnayan.org ওয়েব: www.unnayan.org

যে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বড় বড় বহুজাতিক কোম্পানি ও গোষ্ঠীর কাছে বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থা কিভাবে জিম্মি হয়ে আছে। উচ্চহারে শুল্ক আসলে ঐ দেশের নিজস্ব পণ্যকে বিশেষ সংরক্ষণ সুবিধা দেয়ার জন্য আরোপ করা হয়ে থাকে।

শুল্ক প্রতিবন্ধকতা না থাকলে যে অন্য কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা থাকবে না, এমনটি মনে করার কোনো সুযোগ নেই। পণ্য রপ্তানিতে কোনো শুল্ক নেই, অথচ এমন কিছু নিয়মকানুন আরোপ করা হয়েছে যা পরিপালন করে পণ্য রপ্তানি হয়ে পড়ে কঠিন ব্যাপার। এধরনের সমস্যাকে বলা হয় অ-শুল্ক প্রতিবন্ধকতা।

বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রপ্তানি বাজার হলো ইউরোপীয় ইউনিয়ন। আর তৈরি পোশাকের প্রধান বাজারই হলো ইইউ। ২০০৪ সালে মোট পোশাক রপ্তানির ৫৯.৬% গেছে ইউরোপের বাজারে আর ৩১.৬% গেছে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে। ইইউতে বাংলাদেশের পোশাক জিএসপি (জেনারেলাইজড সিস্টেম অব প্রেফারেন্স) ব্যবস্থার আওতায় শুল্কমুক্তভাবে পণ্য রপ্তানি করতে পারছে। কয়েক বছর ধরে 'অস্ত্র বাদে সবকিছু' চুক্তির আওতায় বাজার সুবিধা দেওয়ায় ইইউ-র বাজারে বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর পণ্য রপ্তানির সুযোগ অনেক প্রসারিত হয়েছে। তারপরও বাংলাদেশ কিন্তু এই অগ্রাধিকার সুবিধা পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারছে না। ২০০২ সালে ইইউ-তে বাংলাদেশের মোট রপ্তানির ৬১.৩% হয়েছে জিএসপি সুবিধার আওতায়। আর তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রে মোট রপ্তানির ৫৭.৪% এই সুবিধা ব্যবহার করতে পেরেছে। আর এটি হচ্ছে রুলস অব অরিজিনের কারণে যেখানে ইইউ-র বাজারে পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশী পণ্যকে অধিকহারে দেশীয় মূল্য সংযোজন করতে হয়। এভাবেই একদিকে সুবিধা দিয়ে অন্যদিকে প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা ধনী দেশগুলোর একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে।

বহুপাক্ষিক বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় এখন স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য নতুন বিপদ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে প্রেফারেন্স ইরোসন। বাংলাদেশের বিষয়টিই আমরা এখানে বিশেষণ করব। বাংলাদেশ কিন্তু বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-য়ের চাপে আমদানি শুল্ক হার ব্যাপকভাবে কমিয়ে ফেলেছে। ১৯৯২-৯৩ অর্থ বছরের বাংলাদেশে আমদানি শুল্কের মোট ১৫টি ধাপ ছিল যেখানে সর্বোচ্চ শুল্ক ছিল ৩০০%। ১৩ বছর পর ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে এসে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শুল্কহার ২৫% আর শুল্কধাপ চারটি (০%, ৭.৫%, ১৫% ও ২৫%)। এই যে সর্বোচ্চ শুল্ক হার ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের ৩২.৫% থেকে এক লাফে ২৫%-য়ে নামিয়ে আনা হলো এটা করা হয়েছে আইএমএফ-য়ের পরামর্শে। আইএমএফ-য়ের সঙ্গে সম্পাদিত 'পিআরএজিএফ' চুক্তির আওতায় সাত পর্যায়ে ৪৯ কোটি ডলার সাহায্য পাওয়ার অন্যতম শর্ত হিসেবে। আবার ১৯৯২-৯৩ অর্থ বছরে গড়ে 'অভারিত' ও 'ভারিত' ওয়েটেড শুল্কহার ছিল যথাক্রমে ৪৭.৪% ও ২৩.৬%। এক যুগ পেরিয়ে এসে ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে এটি হয়েছে যথাক্রমে ১৩.৫২% ও ৯.১%। আবার ১৯৯২-৯৩ অর্থ বছরে মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৬৪৫.৪ কোটি ডলার যার মধ্যে উন্মুক্ততার হার ছিল ২০.১%। আর ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে তা হয়েছে ৩০%। সর্বশেষ ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেট পাসের মাত্র দেড় মাসের মাথায় সরকার ৩,৩৫২টি কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্যের শুল্কহার কমিয়ে দিল। কাচাঁমালের শুল্কহার ৭.৫% থেকে কমিয়ে ৬% এবং মধ্যবর্তী পণ্যের শুল্কহার ১৫% থেকে কমিয়ে ১৩% করা হয়েছে।

এই পরিসংখ্যানগুলোই বলে দেয় স্বল্পোন্নত দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ তার বাজার কতখানি উন্মুক্ত করে দিয়েছে, শুল্ক হার কতটা নামিয়ে এনেছে। অন্যদিকে উন্নত বিশ্ব কিন্তু ঠিকই তাদেরর উচ্চ শুল্ক হার বজায় রেখেছে। সে কারণেইতো এখন এতো হৈচৈ হচ্ছে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা চুক্তির আওতায় ধনী দেশগুলোকে শুল্ক কমানোর জন্য চাপ দেয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে নামা আলোচনায় উন্নত দেশগুলোকে আমদানি শুল্ক কমাতে হলে বাংলাদেশ এসব দেশে যেটুকু বাজার সুবিধা পাচ্ছিল তাও খোয়াতে আরম্ভ করবে। ২০০৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে তৈরি পোশাকখাতের কোটামুক্ত বাজারে চীনের জয়যাত্রাই প্রেফারেন্স ইরোসনের একটি দৃষ্টান্ত হতে পারে। ২০০৫ সালের জানুয়ারি-জুন সময়কালে অবাধ বিশ্ব বাজারে চীনের তৈরি পোশাক পণ্য রপ্তানি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় বেড়েছে ৬৫.৫%। একই সময়ে ভারতের রপ্তানি বেড়েছে ২৭.২% এবং বাংলাদেশের ২০.৫%। যেহেতু চীন ও ভারত এখন বাংলাদেশের কাতারে দাড়িঁয়ে প্রতিযোগিতা করছে, সেহেতু বাংলাদেশের জন্য প্রতিযোগিতা কঠিনতর হয়ে গেছে। আগে কোটার কারণে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও চীন ও ভারত অধিক পণ্য রপ্তানি করতে পারত না। এখন মুক্ত বাজারে তারা অবাধে প্রবেশ করছে তাদের পণ্য নিয়ে। চীনের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো কম দামে তারা পণ্য রপ্তানি করতে পারছে যা বাজার বিস্তারে অন্যতম সহায়ক।

নামা আলোচনা যদি অব্যাহত থাকে এবং বাস্তবায়নের পথে এগোয়, তাহলে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য আরেকটি মনুষ্যসৃষ্ট বড় ধরনের বিপর্যয় নেমে আসবে। নামা আলোচনায় তাই বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর দাবি হওয়া উচিত: একদিকে, বিশ্ব বাজারে সকল প্রকার শুল্ক-মুক্ত ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার, শিথিল 'রুলস অব অরিজিন' এবং 'এন্টি ডাম্পিং' ও কাউন্টারভেইলেইং ব্যবস্থা থেকে স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে অব্যাহিত দেয়া, অন্যদিকে 'প্রেফারেন্স ইরোসন' নিরোধকল্পে বৈশ্বিক কাঠামো তৈরী করা। একই সঙ্গে এমন এক ধরনের দেশীয় নীতি কাঠামো গড়ে তোলা যার ফলে শিল্পায়ন বৃদ্ধি পাবে এবং অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। তদুপরি স্বল্পোন্নত দেশসমূহের শিল্পায়নে বাঁধা সমূহ দূরীকরনে বৈশ্বিক কর্মসূচি প্রয়োজন।

বর্তমান সংখ্যাটি Unkept Promises - Non-agricultural Market Access at the WTO - A Case Study of Apparel Trade of Bangladesh' অবলম্বনে রচিত, লেখক: রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর ও ইকবাল আহমেদ। আসজাদুল কিবরিয়া বর্তমান সংখ্যাটি প্রস্তুত করেছেন। ইংরেজি সংস্করণটি পাওয়া যাবে

http://www.unnayan.org/other/Unnayan%20Onneshan_TNLP_NAMA.pdf

চলতি সংখ্যাটি নিজেরা করি ও উন্নয়ন অন্বেষণের যৌথ কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রকাশিত। বাংলাদেশ কার্যদলের পক্ষে বর্তমান সংখ্যাটি প্রকাশ করেছেন জাকির হোসেন, সদস্য সচিব।

নিজেরা করি
Nijera Kori

নিশ্চিত করো ন্যায্য বাণিজ্য
MAKE TRADE FAIR

উন্নয়ন অন্বেষণ
Unnayan Onneshan
The Innovators
centre for research and action on development